সংবাদ বিবৃতি

হাইনার বিলেনফেল্ড

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার

বাংলাদেশ সফরে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

ঢাকা

I. সূচনা

৩১ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি জাতিসংঘ ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে বাংলাদেশ সফর করি। সবার আগে আমি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমাকে এই সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানোয় এবং পুরো সফরের প্রস্তুতি ও সফরের সময় সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ঢাকায় জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টাকে তার লজিস্টিক্যাল, সাংগঠনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা দেওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে সক্রিয় আগ্রহ দেখানোয়। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কথপোকথনে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন ধর্মের সদস্য, আদিবাসীদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সবাইকে; যারা তাদের অভিজ্ঞতা, ধারণা ও অন্তদৃষ্টি বিনিময় করেছেন। প্রধানত ঢাকায় আমরা অসংখ্য চমৎকার ও খোলামেলা আলোচনা করেছি। বান্দরবান ও রাঙামাটিতেও করেছি। আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি এই অভিজ্ঞতার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি বাংলাদেশের মানুষের আতিথেয়তা দারুণ উপভোগ করেছি।

বাংলাদেশ একটি জটিল দেশ, এখানে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা বহুমুখী। অবাক হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয় যে, আমাদের আলোচনায় একটি বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উঠে এসেছে। এটা আমার জন্য সহজ ছিল না যে, সব দৃষ্টিকোণগুলো এক সঙ্গে আনা এবং সাংঘর্ষিক তথ্যগুলো গ্রহণ করে মূল্যায়ন করা। আমি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করব যে, আজ সংবাদ বিবৃতিতে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তে আমি কী উপস্থাপন করব। এই সংবাদ বিবৃতি আর চূড়ান্ত প্রতিবেদন গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। চূড়ান্ত প্রতিবেদন ২০১৬ সালের মার্চে মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩১তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে। যখন চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে তখন আমিও সম্পৃক্ত থাকব এবং সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করব; সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ এই প্রাথমিক ধারণা ও পর্যবেক্ষণের বিষয়ে আরও তথ্য এবং ব্যাখ্যা পাবে।

সারাংশতে যাওয়ার আগে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে এবং বাংলাদেশের অনুমোদন করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। এগুলোতে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রত্যেকের অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; সে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হোক কিংবা দেশের সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের কেউ হোক। ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা হলো বিস্তৃত এবং প্রথাগত বিশ্বাসীদের, ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে সমালোচক ও ভিন্নমতের ভাবনার মানুষের রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক মতে, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা 'অভ্যান্তরীণ সংখ্যালঘুদের' রক্ষা করে; বলা যায়, কেউ ধর্ম বা বিশ্বাসের একটি বিশেষ শাখার। সার্বজনীন এই অর্থে প্রতিটি মানুষের মানুষ হিসেবে তার মর্যাদার স্বীকৃতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে পার্থক্য বাস্তবিক অর্থে হয়তো গুরুত্ব হারায়। তবুও একটি বহুত্ববাদী সমাজে সাধারণ পরিবেশে ধর্মীয় বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারণার ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে। আমার পর্যবেক্ষণগুলোতেও, 'সংখ্যালঘু' পরিভাষাটি মাঝে মাঝে উঠে আসবে। আমি শুরু থেকে স্পষ্ট করতে চাই, এতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে না যে, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রধানত একটি সংখ্যালঘুদের ইস্যু। এটা সব মানুষের অধিকার, তা সে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো ভাগের হোক না কেন। এই পরিভাষাগুলো গবেষণামূলক বাস্তবতা, ক্ষমতায় সহগামী অসাম্যেও, নিরাপত্তা অর্থে এবং অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনায় অনিবার্য।

II. আন্তঃধর্মীয় সংহতি ও সহাবস্থান

১. বহুত্ববাদী সহাবস্থানের সংহতির সুগভীর ঐতিহ্য

এই সফরে আমি যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের প্রায় প্রত্যেকে এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় বিভক্তির মাঝেও সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করে। বাংলাদেশ এবং এই উপমহাদেশে ধর্মীয় ল্যান্ডস্কেপ সব সময় বহুত্ববাদী আছে। বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (মোট জনসংখ্যার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ), হিন্দুরা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে (প্রায় ৮ শতাংশ), এরপর বৌদ্ধ (০.৭ শতাংশ) এবং খ্রীষ্টানরা (০.৩ শতাংশ)। যেহেতু এই চার ধর্মীয় সম্প্রদায়-ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান্- নিয়মিতভাবে সব আলোচনায় উল্লেখ ছিল; আরও কিছু ধর্মী সংখ্যালঘু রয়েছে যেমন, বাহা সম্প্রদায়ের তিন লাখের মতো মানুষ আছে বাংলাদেশে। আদিবাসীদের মধ্যে অজানা সংখ্যক ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক (কখনো কখনো 'সর্বপ্রাণবাদ' বলা হয়) চর্চা রয়েছে, যারা উল্লিখিত যে কোনো একটি ধর্মের সঙ্গে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা হানাফি সুন্নি মুসলমান। কিছু আছে জাফরি শিয়া, ইসমাইলি ও আহমেদিয়া যারা মুসলিমদের মধ্যেই বিভক্তির কারণে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগত দিক থেকে

অনেক ছোট । খ্রীস্টানদের মধ্যেও ভাগ আছে, ক্যাথলিক, অ্যাংলিকানস এবং বিভিন্ন ধরনের প্রটেস্টান্টিজম যেমন ব্যাপটিজম। এই চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না বাংলাদেশে বসবাসকারী অ্যাগনোসটিকস ও অ্যাথেয়িস্টদের কথা উল্লেখ করা না হয়।

আমি অনেক ধর্মীয় উৎসবের নাম শুনেছি, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন অংশ নিয়ে তা উদযাপন করে থাকে। এটা হয়ত এই চিত্র তুলে ধরে যে, এখানকার বিভিন্ন ধর্মেও মানুষ শুধু একত্রে বসবাসই করে না, পরস্পরের ধর্মীয় উৎসবে আগ্রহভরে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে। এই উৎসবগুলোতে রীতিঅনুসারে ভিন্ন ধর্মালম্বী হলেও প্রতিবেশীরা খাবার বিনিময় করে, শিশুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে; যার মাধ্যমে তারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লালন করে। একটি মুসলিম স্থাপনা পরিদর্শনের সময় আমি দেখলাম, পাশেই হিন্দু সম্প্রদায় কৃষ্ণের জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করছে। ইসলামী একটি ভবনের স্থাপত্যকলার প্রশংসা করার সময় আমি একই সময়ে হিন্দুদের সঙ্গীত শুনলাম। কৃষ্ণের বাঁশি ছিল উল্লেখযোগ্য। এটাকে আমি আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের স্বচ্ছন্দ পরিবেশের উদাহরণ হিসেবে নিলাম, যা সাধারণত এই দেশে বিরাজমান।

সুস্পষ্টভাবে, বাংলাদেশ এবং এই পুরো উপমহাদেশে ধর্মীয় বহুত্ববাদ গভীরভাবে প্রোথিত। কিছু আলোচক বলেন যে, দীর্ঘ এই ঐতিহ্যও ইতিহাস আর পেছনে না গেলেও মোগল সম্রাট আকবরের আমল থেকে দেখা যায়। অন্যরা উল্লেখ করেন, সুফিবাদের ইতিবাচক ভূমিকা উন্মুক্ত এই ধর্মীয় পরিবেশের কাঠামো দিয়েছে। যদিও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও চরমপন্থা নিঃসন্দেহে জেগে উঠেছে, যা বাংলাদেশে সংহতি ও আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের সংস্কৃতিতে সাধারণত দেখা যায় না। ইসলামী চরমপন্থাকে নাকচ করা না গেলেও, সাধারণ ব্যাখ্যা হলো এটাতে ধর্মীয়ভাবে বেশি কিছু করার নেই, কিন্তু ধর্মকে যদি রাজনৈতিকভাবে লাভের উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়। ধর্মের রাজনীতিকরণ, বিশেষ করে ইসলামের; যা আমাদের অনেক আলোচনায় উঠে এসেছে। এটা শুধু সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময়ই নয়, সুশীল সমাজ এবং অন্য ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময়ও উঠে এসেছে।

২. ধর্মীয় জনসংখ্যায় পরিবর্তন

সাম্প্রতিক দশকগুলোয় বাংলাদেশে ধর্মীয় জনসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এর প্রধান কারণ হলো অভিবাসন। জনসংখ্যায় পরিবর্তন, বিশেষ করে যখন কম সময়ের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা হয়; সাধারণভাবে বর্তমানে বিভিন্ন জাতিগত বা ধর্মীয় জনসংখ্যার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। যা সাধারণভাবে এই দেশের বৈশিষ্ট তুলে ধরছে।
সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় হলো, এই দেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ, বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ শতাংশে। দৃশ্যত, এই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হলো সম্পত্তি ইস্যু; যার সমাধান করার চেষ্টা করছে সরকার। (দেখুন: ঘ.১) এ ছাড়া হয়রানি, এমনকি শারীরিক আক্রমণের শিকার হয়েও ঝুঁকিপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়েন হিন্দুরা।

চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায়, যেখানে ধর্মীয় ল্যান্ডস্কেপ সব সময় বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে ভিন্ন, সেখানে ধর্মীয় দিক থেকে জনসংখ্যার পরিবর্তন আরও জোরালো। এটা শুধু অতীতে সরকারের সিদ্ধান্তে দেশের অন্য অংশের মানুষকে ওই এলাকায় স্থানান্তরের কারণে নয়। কয়েক দশক আগেও, যখন আদিবাসী লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করত; অধিকাংশ ছিল বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের; তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখন আদিবাসী ও বাঙালি জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক কম-বেশি হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে, ইসলাম বেশি করে দৃশ্যমান হয়েছে; এটা শুধু নতুন নতুন মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ হওয়ার কারণে হয়নি। এ ছাড়া অনেক হিন্দু পরিবারও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে বসবাস করছে। দেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদেরও বেশি নিরাপদ ভাবছে ওই হিন্দুরা। এটা উল্লেখ করতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি যদিও মূলত এড়িয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তা অভিন্ন নয়। কিছু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করছেন, যারা বাঙালি ব্যাকগ্রাউন্ডের। কিন্তু সেখানে বসবাসকারীরা এই দুই ধর্মের অধিকাংশই আদিবাসী।

৩. আঞ্চলিক গতিশীলতা

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বহুজাতিক শ্রম অভিবাসন, শরণার্থী সংকট, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্বায়ন সব দেশেই বিশাল প্রভাব ফেলছে। বাইরের এই উন্নয়নগুলোও বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সম্পর্কতে প্রভাব ফেলছে।
অনেক আলোচনাতেই আমি একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর অন্যান্য ধর্মীয় মানুষগুলোর বিষয় জড়িত করা। এ ক্ষেত্রে ভারতের হিন্দুদের জড়িত করার বিষয়টি একেবারে স্বাভাবিক এবং এটা শুধু বাইরে থেকে আরোপিত নয়; সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় নিজেও তা বিনিময় করে। বাংলাদেশের অনেক হিন্দুই ভারতে বসবাসকারী তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধনকে উপভোগ করে এবং সবসময় বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাওয়ার পথ খোলা রাখে যখন সম্পত্তি হারায়, চাকরি বা রাজনীতিতে তাদেও আস্থা হারায়, এমন জরুরি পরিস্থিতিতে ওই পথ খোলা রাখে। এটা সবাই জানে যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক এখনো জটিল। কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করা হলেও 'পাকিস্তানি মানসিকতা' বা 'পাকিস্তানি দর্শন' সুস্পষ্টভাবেই বাংলাদেশে নেতিবাচক সংজ্ঞা বহন করে। আমি শুনেছি, পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা মিয়ানমারের বৌদ্ধদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, যেখানে বৌদ্ধরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিএইচটি এলাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা শোনা যায়। সেখানে মুসলিম জঙ্গিরা বৌদ্ধদের এ দেশ ছেড়ে মিয়ানমারে গিয়ে বসতি স্থাপনের জন্য হুমকি দেয়। সৌভাগ্য যে, এ ধরনের বিষয় বিস্তৃত সমাজে থেকে শোনা যায় না। পাশ্চাত্যে বলা যায়, ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকাতে খ্রিস্টান বেলায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদেশের ওই একই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রবণতা, বিশেষ করে বাংলাদেশে সরাসরি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে; এটা বর্তমানে জাতির অখ-তা জন্য সরাসরি কোনো হুমকি নয় এবং এটা আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানের সংহতির পরিবেশে খুব জোরালোভাবে প্রভাব ফেলছে না। তবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে পরিস্থিতি কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পররাষ্ট্র সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তার নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ওপরও পড়তে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রভাব বৃদ্ধির বিষয়টি আমি অনেক বেশি শুনেছি। আন্তঃধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় থাকা কোনো একটি দেশে ইসলামী মৌলবাদের উত্থান প্রায়ই উপসাগরীয় অঞ্চলের ইসলাম সম্পর্কে অতি-রক্ষণশীল ব্যাখ্যা থেকে হয়ে থাকে।

একটি স্পর্শকাতর ইস্যু, যা আমি পর্যাপ্তভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করতে পারিনি; রোহিঙ্গা সম্পর্কিত, যাদের অনেকে মিয়ানমারে চরম নির্যাতনের মুখে পলিয়েছে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা এখন অনিশ্চিত অবস্থায় বাংলাদেশে বাস করছে এবং তাদের উপস্থিতি বৈধ বলে স্বীকার করে না সরকার। সরকারের বিজ্ঞপ্তি মতে, বাংলাদেশের নাগরিকদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের বিয়ে হতে পারবে না । যা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে একটি বৈষম্য। রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো, তারা কট্টর ইসলামী মনোভাব পোষণ করেন, যা জনগণের একটি অংশের কাছে তাদের সন্দেহভাজন হিসেবে তুলে ধরে।

III. সাংবিধানিক মূলনীতি এবং চর্চায় তার প্রয়োগ

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণার ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়ন

কাঠামোর দিকে থেকে সরকার বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিকে দারুণ গুরুত্ব দিয়েছে। এটা ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছে। অনেক আলোচনাতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সবসময় প্রভাবশালী থিম হিসেবে উঠে এসেছে। কিছু আলোচক ঘনিষ্ঠভাবে এই নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, আবার কেউ রাষ্ট্রের ওই ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর দিকে যেতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শব্দটি ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। যা প্রায়ই আলোচনাকে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে এবং কিছু সময়ে অযাচিত বিতর্কের সৃষ্টি করে। 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' কখনো কখনো এই ধারণা দেয় যে; আমি বলতে পারি: ভুল-ধারণা দেয় যে, এটা ধর্মবিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন। বিশ্বে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকারের উদাহরণ আছে। বাংলাদেশে বিরাজমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মানে হলো একটি অঙ্গীকার- যা সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে- সব ধর্মের মানুষের জন্য স্বাধীন, ভয়মুক্ত ও বৈষম্যহীন একটি পরিবেশ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এ ধরনের 'সমন্বিত' বোঝাপড়া, একটা বড় ধরনের

উচ্চাকাঙ্ক্ষা; যার জন্য রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ দরকার। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, সুশীল সমাজের উন্নয়ন, সংখ্যালঘু পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং অন্যান্য কার্যক্রম হাতে নিতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে স্রেফ 'নিষ্ক্রিয়তার' সঙ্গে সমান বলে ভাবা উচিত হবে না, ধর্ম বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 'অঙ্গীকারবদ্ধ নয়'-এমন মনোভাব', অন্যান্য সাধারণ ভুলবোঝাবুঝির মতো বিষয়। ধর্ম ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের সক্রিয়াভাবে রক্ষা করা এবং এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সবার ধর্ম বা বিশ্বাসের অধিকারের ওপর ভিত্তি করে এটা করতে হবে, যার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ নং অনুচ্ছেদে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমন্বিত বোঝাপড়ায় সবার জন্য ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার স্বার্থে স্বাধীন পরিবেশ করে দেওয়াই মূলনীতি যা গণতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। অন্য মূলনীতি যা বাংলাদেশের সংবিধান গড়ে দিয়েছে। গণতন্ত্র স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়, যেটাকে অনেক সময় এমন সরলভাবে বর্ণনা করা হয়। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন রাজনৈতিক বহুত্ববাদী সমাজে প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে; গণতন্ত্রে প্রত্যেকের মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে; বিশেষ করে নাগরিকদের অংশগ্রহণের অধিকার থাকতে হবে, যা জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। গণতন্ত্র থাকতে পারে না যদি না রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো, সাংবাদিক, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এবং অন্যান মানুষ স্বাধীনভাবে এবং ভয়মুক্ত ও বৈষম্যহীনভাবে মতপ্রকাশের জায়গা না পায়। এই অর্থে, একজন গণতন্ত্রকে এভাবেও বর্ণনা করতে পারে যে, গণতন্ত্রে জায়গা ছেড়ে দেওয়াই মূলনীতি। যার সঙ্গে সমন্বিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

যখন আমি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের মূলনীতিতে অনেক অঙ্গীকার শুনতে পেলাম, সেখানে বাংলাদেশে সেগুলোর বাস্তবায়নে সাংঘাতিক সমস্যার বিষয়টিও উঠে এল। সংবিধানের কাছ থেকেই অসঙ্গতি এল, যেখানে ২-এর 'ক' অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আমি তুলে ধরছি যে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অঙ্গীকারের এবং ইসলামকে স্বীকার করার মধ্যে ন্যূনতম অসঙ্গতি নেই। একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সমাজকে ভালো সেবা দিতে পারে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মীয় আচার, অনুগত্য পালন করবে, ধর্ম চর্চা করবে এবং ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করবে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং একটি ধর্মীয় সমাজ সংহতিপূর্ণভাবে একত্রে থাকতে পারে। কিন্তু একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র একই সঙ্গে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হতে পারে না, রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র ধর্ম দাবি করতে পারে না। যদিও সংবিধানের ২এর ক অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা দেওয়ার পর এটাও বলা হয়েছে যে, সরকার অন্য সব ধর্মের সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করবে, অসঙ্গতি থেকে গেল। এটা স্রেফ শিক্ষার কোনো ইস্যু নয়। এটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা খুব বেশি অনুভব করেন। এ ছাড়া পারিবারিক আইন বিস্তৃত অর্থে ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। যা ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার ইস্যুতে তুলে ধরা যায়। এটা নীচে আলোচনা করা হয়েছে। (সেকশন

২. রাজনীতিকে ধর্মীয়করণ যখন ধর্মের রাজনীতিকরণের লড়াই?

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনেক আলোচনাতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকার ধর্মীয় চরমপন্থার উত্থানের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সমর্থন করা প্রয়োজন বলে মনে করে। যদিও জঙ্গিদের ইসলামের ব্যাখ্যা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও আন্তঃধর্মীয় এই সমাজে অনুরণিত নাও হতে পারে। তারপরও চরমপন্থীদের প্রভাব একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা শুধু সরকারের জন্যই নয়; সুশীল সমাজের সংগঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর জন্যও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমর্থনে সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা উল্টো ফল দিয়েছে বলে মনে হয়। বিষয়টি পুরোপুরি বোঝা এটা আমার জন্য সহজ ছিল না এবং আমি এখনো এটা বুঝতে সাংঘর্ষিক তথ্য ও ধারণা পাচ্ছি। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতির সঙ্গে আংশিক সমঝোতা করে বলে শুনেছি। সম্ভবত ধর্মীয় চরমপন্থীদের তৃপ্ত করার জন্য এটা করা হয়ে থাকে। 'ধর্মের রাজনীতিকরণ'-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে এ ধরনের প্রবণতা এবং 'রাজনীতিকে ধর্মীয়করণ'কে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। এমনকি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাংবিধানিক মূলনীতির পক্ষাবলম্বন, যা অদ্ভুত রকমের বিদ্রুপাত্মক। উদাহরণ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি বিবৃতির কথা বলা যায়, যেখানে বলা হয় আহমাদিয় সম্প্রদায় মুসলিম নয়। আমি নিজে সেই বিবৃতি শুনেছি, সরকারি

প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময়ও। কিন্তু ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এসব বিষয়ে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের বোঝাপড়া, নিজের সংজ্ঞার প্রতি সম্মান দেখানো। নিজের বোঝার বিষয়টি সবাই বিনিময় করবে এটা আশা করা যায় না, কিন্তু সরকারকে এই সম্মান দেখানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। একই ধরনের বিপরীতার্থক বিবৃতি দেওয়ার ঘটনা ঘটে সম্প্রতি অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট খুন হওয়ার ঘটনায় এবং অনলাইনে সক্রিয় থাকা অনেকেই জীবননাশের হুমকি পাওয়ার পর। যদিও এসব হুমকি ও ইসলামের নামে এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের নিন্দা জানানো হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে সরকারের প্রতিনিধিরা জনগণের সামনে বলেন, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট যারা ধর্মীয় বিষয়ে সমালোচনামূলক ভাবনা প্রকাশ করেন, বিশেষ করে ইসলাম বিষয়ে; তারা 'বেশি দূরে' যেতে পারবেন না। সরকারের প্রতিনিধিদের এমন মন্তব্য সমাজে ভিন্ন ধরনের বার্তাই পাঠায়।

মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের বিষয়টি মূলত প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানত ধর্মীয় চরমপন্থীদের কাছ থেকে চাপের মুখে থাকে তারা, তাদের কেউ কেউ 'ফ্রেন্ডলি ফায়ারের'ও শিকার হন। একজন আলোচক এ কথা জানান। এমনকি সুশীল সমাজের কর্মীরা যারা বর্তমান সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ইস্যুর সঙ্গে একমত, তারাও হতাশা অনুভব করেন। সম্প্রতি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সদস্যদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি মত প্রকাশের জায়গা দ্রুত সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ধারণাকেই সমর্থন করে। যেটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের মূলনীতির ক্ষতি করবে।

৩. বাস্তবায়নের বাধাসমূহ

সাংবিধানিক বিষয়, আইনি মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নে বাধার বিষয়গুলো আমি বার বার শুনেছি, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে। এই সমস্যা সমাজের বিভিন্ন খাতকে প্রভাবিত করে। যেমন-শিক্ষা, জন কল্যাণ, ধর্মীয় বিষয়, সম্পত্তি ইস্যু এবং এমনকি আইন শৃঙ্খলবাহিনীর কাছ থেকে শারীরিকভাবে নিরাপত্তা পাওয়ার নিশ্চয়তার বিষয়টিও। কিছু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মতে, প্রশাসনে কাজ করা কিছু মানুষের 'মানসিকতা'ও নিশ্চিতভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে। যে মানুষেরা সংখ্যালঘুদের পছন্দ করে না, তারা সংখ্যালঘুদের পক্ষে আইন বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেন। কেউ উল্লেখ করেন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগত সাধারণ ত্রুটির কথা, যার সুযোগে স্বেচ্ছাচারিতার চর্চা চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে।

আমার সফরের সীমিত সময়ে আমি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগুলোর মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করার দিকে যেতে পারিনি। যেটা করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা গ্রহণের প্রয়োজন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ইস্যু যেখানে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি এ ধরনের পরিস্থিতি থাকে; সেখানে সংখালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফাঁরাক সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষগুলো-ধর্মীয় সংখ্যালঘু, লৈঙ্গিক ও কম আয়ের মানুষ প্রভৃতি- এমনকি আরও অনেকে দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন।

IV. নিরাপত্তাহীনতা বোধ

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন, আদিবাসী প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোরর সঙ্গে আলোচনায় আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ও উদ্বিগ্নতায় ভোগেন। এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতার বিভিন্ন রাজনৈতিক, আইনি ও সামাজিক মাত্রা রয়েছে। যা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং গোষ্ঠী পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পারে। সম্পত্তির দাবিতে নিরাপত্তাহীনতা, বিশেষ করে আবাসনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, কোনো কোনো সময় তা কোনো ব্যক্তির বা একটি সম্প্রদায়ের শারীরিক নিরাপত্তা ধর্মীয় জঙ্গিবাদের হুমকিতে পড়তে পারে। একটি নির্দিষ্ট ইস্যু, ঝুঁকির সাধারণ অনুভূতি তৈরি করে যা কিছু সম্প্রদায় ধর্মানুভূতি হিসেবে প্রকাশ করে।

১. **জমির মালিকানার প্রতিযোগিতা**
   অমীমাংসিত সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক বাংলাদেশসহ অনেক সমাজকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। বিভিন্নভাবে তা বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়, যা ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য উদ্বেগের। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার

একটি কারণও সেটা। স্বাধীনতার পর এদেশে থাকা হিন্দু জনসংখ্যা এখন ওই সময়ের প্রায় অর্ধেক। ১৯৬৫ সালের 'শত্রু সম্পত্তি আইন' যুক্ত পাকিস্তান আমলে কার্যকর হয়েছিল। হিন্দুদের অনেক সম্পত্তি প্রধানত আবাসন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরও তা 'অর্পিত সম্পত্তি আইনের' মাধ্যমে সেই চর্চা চলছে। যার কারণে অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে বা বিভিন্ন দেশে চলে গেছেন। বাস্তবতা হলো, বাজেয়াপ্ত হওয়া অনেক সম্পত্তিই নিছক দখল হয়ে গেছে। ২০০১ সালে সরকার 'শত্রু সম্পত্তি ফেরত আইন' করে একটা লড়াইয়ের চেষ্টা করছে। যা আইনের নামের মধ্যে বলা হচ্ছে; হিন্দুদের হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি তাদের ফেরত দেওয়া উচিত। এদিকে এই আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যার মুখে পড়তে হবে বলে মনে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত হবে। একই সময়ে এমনকি আজও হিন্দু সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটছে। কোনো কোনো সময় হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হলে এই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। অমীমাংসীত সম্পত্তি ইস্যুটি হিন্দু সম্প্রদায়ে খুব বড় ইস্যু বলে মনে হয়। সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচক উদ্যোগ নিলেও হিন্দু সম্প্রদায় তাদের হারানো ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সম্পত্তির বিষয়ে তিক্ত অনুভূতি পোষণ করেন এবং ফিরিয়ে দেওয়ার যে ব্যবস্থা তাতেও উদ্যমহীন বলে প্রকাশ করেন।

আবাসন নিয়ে বেশ নিরাপত্তাহীনতাও রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। ঐতিহ্যগতভাবে ওই অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। মালিকানার 'দলিল' না থাকায় জমি নিয়ে অনেক বিরোধ এবং জমি দখলের অনেক অভিযোগ তৈরি হয়েছে। মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, কবরস্থান বা শ্মশান ইত্যাদি ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণভূমির ওপরও সাধারণ আইনি নিরাপত্তাহীনতার প্রভাব পড়ছে। এতে ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগ স্পষ্টতই বাড়ছে। আর পর্যাপ্ত ও স্থিতিশীল অবকাঠামোর অভাবে ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষত-সংখ্যালঘু অবস্থায়, উন্নতি করতে পারে না। আইনগত স্পষ্টতা ও নিরাপত্তাই তাদের উন্নয়নের পূবর্শর্ত।

বান্দরবান ও রাঙামাটি সফরের সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাদের বেশির ভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁরা স্বীকার করেছেন, গত কয়েক বছরে তাঁদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ব্যাপারে তাঁরা সতর্ক রয়েছেন, যেসবের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংস করে দেওয়া এবং শারীরিক হামলাও রয়েছে। অনান্য কারণের পাশাপাশি ধর্মীয় সম্পত্তির আইনি নিরাপত্তাহীনতাও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের অরক্ষিত থাকার অনুভূতি এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করার জন্য দায়ী। এগুলো তাঁদের ধর্মীয় বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার ওপরও প্রভাব ফেলে।

২. ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা

গত বছরের কয়েকটি সহিংস ঘটনা মানুষের মনে অনিশ্চয়তার ভীতি তৈরি করেছে, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সমালোচনামূলক মত প্রকাশকারী সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি। বেশ সাড়া জাগানো এরকম একটি ঘটনা ২০১২ সালে রামুতে ঘটেছিল। তখন অন্তত ২০টি ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করা হয়। একইসময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের বেশ কয়েকটি বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেয় এবং বিধ্বস্ত মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণ করে দেয়। তাছাড়া এ ধরনের ঘটনা সহ্য করা হবে না বলেও সরকারের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়। অবশ্য, রামুর সহিংসতার ওই ঘটনার হোতাদের কাউকেই এখন পর্যন্ত আইনের আওতায় আনা হয়নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর অনেক সদস্য নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে স্মরণ করেছেন, কীভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর, প্রার্থনালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, এমনকী হত্যা পর্যন্ত। এসব ঘটনায় পুলিশ ও বিচার বিভাগ অপর্যাপ্ত সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁদের হতাশা শুনেছি। এতে মনে হয়, অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়ার মতো একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে একটি ভয়াবহ অপরাধ হচ্ছে মানুষকে অপহরণ করা, বিশেষত মেয়েদের। এসব ক্ষেত্রে ওই মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য থাকে। পাশাপাশি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করার ঘটনাও দেখা যায়। অনেকসময় অপহরণকারীর সঙ্গেই 'বিয়ে' দেওয়া হয়। এসব অপরাধের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদারও চরম লঙ্ঘন হয়, যা ধর্ষণ বা একই ধরনের নিমর্মতার সঙ্গে তুলনীয়। এ ধরনের ঘটনার প্রভাব নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ ও পরিবারগুলোর ওপর দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে। পরিণামে তাঁদের মনে একধরনের প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয় এবং এক পর্যায়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পথে এগিয়ে যায়।

নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোয়, পাঁচ জন অনলাইনকর্মী হত্যার শিকার হয়েছেন। তাঁদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক যোগাযোগের অনলাইন মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়ার জেরেই এসব হত্যাকা- ঘটেছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, ওই কর্মীরা 'নাস্তিক' এবং 'ইসলামের অবমাননাকারী'। এভাবে নাস্তিকতার অভিযোগ দেওয়া সঠিক কি না, তা নিয়ে অন্তত কয়েকটি ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে। তাছাড়া নাস্তিক মনোভাব ধারণ করাটাও প্রত্যেকের ধর্মীয় বা বিশ্বাসের অধিকারের আওতায় পড়ে। আবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তাও বাংলাদেশের সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টত, এসব ঘটনায় সরকারের প্রতিক্রিয়া অস্পষ্টতামুক্ত নয়। কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন সহিংসতার নিন্দা জানাচ্ছে, তেমনি 'সীমা লঙ্ঘন না করতে' মুক্তমনা সমালোচনাকারীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন সরকারের প্রতিনিধিরা। সরকারের এই দুর্বোধ্য অবস্থানের কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভ্যন্তরেও সন্দেহ তৈরি হতে পারে। অনলাইনে সক্রিয় কর্মী এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা আক্রান্ত হলে তাঁদের উদ্ধারে পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হওয়া উচিত হবে কি না, তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। খবরে প্রকাশিত হয়েছে, পুলিশ এরকম কয়েকজন ব্যক্তিকে কার্যকর নিরাপত্তা দিতে স্পষ্ট অপারগতা জানিয়েছে। ফলে কেউ কেউ দেশ ছেড়ে গেছেন, আবার কেউ কেউ যাওয়ার পথে রয়েছেন। হত্যা করার উদ্দেশ্যে সহিংস কট্টরপন্থীরা যে 'কালো তালিকা' তৈরি করেছে, তাতে নাম নেই বা সরাসরি হত্যার হুমকি পাননি-এমন অনেকেও কয়েকটি বেদনাদায়ক ঘটনার প্রভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কারণ, তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সদস্য।

ঝুঁকিপূর্ণ এরকম কিছু পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত করার জন্য 'কমিউনিটি পুলিশিং' প্রকল্প চালু করা হচ্ছে, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলে নানারকমের ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো সহজ হতে পারে। পাশাপাশি পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালে আমি বান্দরবান ও রাঙামাটিতে চলমান কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য পেয়েছি। তাছাড়া, সাধারণ পুলিশ বাহিনী পরিচালনায় যুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাও (সেনাবাহিনীর মতো নয়) পার্বত্য চট্টগ্রামে বেড়ছে এবং তা জাতীয় কোটার চেয়ে স্পষ্টতই বেশি। এতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তাবোধ কিছুটা বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। তবে, 'মিক্সড পুলিশিং'-যেমন: পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বাঙালি ও আদিবাসী ব্যক্তিদের সরাসরি সহযোগিতামূলক অবস্থানের ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

৩. ধর্মান্তরীকরণের সমস্যা

আমার নজরে আসা একটি আবেগময় সংকট ধর্মান্তরীকরণের সঙ্গে জড়িত। ধর্মান্তরীকরণ সাধারণত বিরল ঘটনা, এবং যদি ঘটেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় আন্তঃধর্মীয় বিয়ের প্রেক্ষাপটে। আন্তঃধর্মীয় বিয়ে ছাড়াও ধর্মান্তরীকরণ হয়ে থাকে, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে বা বিভিন্ন ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে। অনেক সময় মুসলমান ব্যক্তিও খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ম্রো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যারা প্রচলিতভাবে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা করে, কয়েক হাজার সদস্য 'কর্ম' নামের একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের অনুসারী হয়েছে।

যারা ধর্ম পরবির্তন করে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়েছেন - অনেক সময় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানাদিসহ - সাধারণত তারা সমাজে একঘরে বা সমাজচ্যুত হওয়ার মতো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। এর কারণ হিসেবে দাবি করা হয়ে থাকে, তাদের এই ধর্ম পরিবর্তন পকৃত নয় বরং বস্তুগত সুবিধা বা অন্য ধর্মীয় সুবিধা পাওয়ার বিনিময় হিসেবে তারা এ কাজটি করেন। সমাজে কলঙ্কিত হবার ভয়ে অনেক ধর্ম পরিবর্তনকারীকে আত্মগোপন করতে হয় অথবা নতুন ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতে হয়। যদিও, এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বোধ শুধু ধর্ম পরিবর্তনকারীদের মধ্যেই দেখা যায় না বরং সব সম্প্রদায়, যেখান থেকে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন - বিশেষ করে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায় - ভীত হয়ে পড়ে যে, তারা শক্তিশালী ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারকদের কাছে ভবিষ্যতে তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের হারাবে। এই আশঙ্কাটিকে স্বীকৃতি জানালেও, বিদ্যমান গুজব ও অবাস্তব অনুমান ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুসারীদের মধ্যেকার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে আমি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাসকে অন্য কোনো বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন বা স্বেচ্ছায় পরিবর্তনের বা অবিশ্বাসী হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। আইনের ব্যাখ্যায় বলতে গেলে, ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা এমনকী নিঃশর্ত সুরক্ষা পাওয়ারও অধিকার রাখে। এরইসঙ্গে বলা উচিত, আরেকজনের ধর্ম পরিবর্তন, যাকে 'কনভারশন' বা 'ধর্মান্তরীকরণ' বলা হয়ে থাকে, এর মানে আরেকজনকে ধর্মমত পরিবর্তনে উৎসাহিত করা, সাধারণত এ চর্চাকে 'মিশনারি কাজ' বা 'দাওয়া' বলা হয়। আরেকজনকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতার আওতাভুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গে কোনো ধরনের সুবিধা বা চাপ দেয়ার বিষয় জড়িয়ে না পড়ছে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ

সতর্কবার্তা। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এই অনুশীলন সবসময় খুব সহজ হয় না, যদিও, এবং এক্ষেত্রে অনেক বেশি অস্পষ্টতা বিদ্যমান। মিশনারি কার্যক্রম অবশ্যই মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেবে না, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যখন কেউ অতিদরিদ্র অবস্থায় থাকে। যদিও যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে বা ধর্মান্তরী হতে চায় সবসময়ই তাদের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো উচিত, তাদের ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতার আলোকে।

ভবিষ্যতে আসতে পারে এমন ধর্মীয় বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব এড়াতে, মিশনারি কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার সম্ভবত একটি নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক সহ-ধর্মবাদীদের ভিসা প্রদান কার্যত নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এটা করা হয়েছে সম্ভবত এই ভয় থেকে যে এসব ব্যক্তি অনভিপ্রেত মিশনারি কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা এ ধরনের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এই কারণে যে অন্য দেশ থেকে সমমনা বিশ্বাসীদের আমন্ত্রণ করে আনা এখন অনেক কঠিন হয়ে পড়বে,যা তাদের ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতার ওপর এক ধরনের হস্তক্ষেপ। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যরা বলেছেন তাদের উপরে পরিকল্পিতভাবে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে বলে তাদের মনে হচ্ছে।

V. শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

১. তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রত্যেকের জন্য অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। স্কুল শিক্ষার এই বাধ্যতামূলক পর্যায়ে, প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট সুরক্ষাও নিশ্চিত করা বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা যেনো নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের বাইরে অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোনো চাপের মুখোমুখি না হয়। কোন পথে বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার আয়োজন করা উচিত তার জন্য বিদ্যালয়ই ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

সমস্যা কি তা পরিস্কারভাবে জানতে, এক দিকে 'ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য' এবং অন্য দিকে 'ধর্মীয় নির্দেশনা' এ দুটি বিষয়ে পার্থক্য করাটা হয়তো সহায়ক হবে। 'ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য' (অনেকটা ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের মতো তথ্য দেয়া) ন্যায়সঙ্গতভাবেই আবশ্যিক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আর 'ধর্মীয় নির্দেশনা' সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে - যেমন ধর্মীয় প্রার্থনা, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিতি - যথাক্রমে শিশুর বা তার বাবা-মায়ের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে শেখানো উচিত না।

২. সরকারি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জটিলতা বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয় ও বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বিদ্যালয় সমান্তরালে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তাই বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতির পরিপূর্ণ চিত্রটি পাওয়া খুব সহজ না। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে 'ধর্ম শিক্ষা' একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়, যেখানে মূলত নিরপেক্ষ তথ্যের সমাহার এবং ধর্মীয় আচরণ পালনের নির্দেশিকা থাকে। এখানে যে ধারণাটি কাজ করে সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থী তার নিজ ধর্মমতের বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করে যা একই ধর্ম পালনকারী শিক্ষকের মাধ্যমে পড়ানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই, ধরে নেয়া হয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য, কিন্তু সবসময় এমনটি ঘটে না। তাছাড়া, ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা শ্রেণি স্থাপনের চাপও বাড়ছে।

আমি বেশ কিছু সংখ্যক উদাহরণের কথা শুনেছি, যেখানে এই নীতি বাস্তবায়নে কৌশলগত সমস্যার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক না পাওয়ার কারণে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের ধর্ম শিক্ষা নিতে হচ্ছে এমন শিক্ষকের কাছ থেকে যার ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রশিক্ষণ নেই। বিশেষ করে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। অন্যান্য ক্ষেত্রে, ধরা যাক বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে আসা, শিশুদের ইসলাম বা হিন্দু শ্রেণিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় যে তাদের সন্তানদের হয়তো বা

তাদের নিজস্ব ধর্ম থেকে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। আমি এমনও একটি উদ্বেগ সৃষ্টিকারী ঘটনার কথা জেনেছি যেখানে একটি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে জানতে চাওয়া হয়েছে কি কারণে আহমাদিয়াদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করা উচিত।

সরকারি বিদ্যালয়ে গিয়ে ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেয়ার আমার পরিকল্পনা ছিলো, কিন্তু পরিদর্শনটি বাতিল করতে হয় কারণ সংক্ষিপ্ত নোটিশে একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।

৩. মাদ্রাসা

একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ইসলামি বিদ্যালয়ে পড়ে, সাধারণত মাদ্রাসা হিসেবে যেগুলো পরিচিত। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি শাখায় বিভক্ত- আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হচ্ছে উভয়ই ইসলামি শিক্ষার ওপর জোর দেয়, যথা- কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলিয়া মাদ্রাসাকে জাতীয় পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও প্রতিষ্ঠা করেছে।

যেসব মাদ্রাসা জাতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে, তাদের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা নিতে হয়, যার মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা শিক্ষা (বাংলা, ইংরেজি ও আরবি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত। অনেক মাদ্রাসাতে ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে বসে ক্লাস করে। ঢাকা ও বান্দরবানে আলিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শনের সময় আমি প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও স্বতঃস্ফূর্ত কথাবার্তা হয়েছে। ঢাকার একটি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ধর্মীয় ও শিক্ষা বিষয়ে বেশ উদার মনোভাব প্রকাশ করেন।

যেখানে সম্ভবত অর্ধেক মাদ্রাসা জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, কিন্তু কওমী মাদ্রাসার সংখ্যাও কম না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতার বাইরে সেগুলোর নিজস্ব পাঠ্যক্রম আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রায়শঃ তাদের শঙ্কা প্রকাশ করেন যে, মাদ্রাসা, বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসা, কট্টরপন্থি দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করে, যেমন সব অমুসলিমকে 'কাফের' হিসেবে আলাদা করে ফেলা। মাদ্রাসার বিস্তার, বিশেষ করে যেগুলো জাতীয় পাঠ্যক্রমের অধীনে পরিচালিত হয় না, সম্ভবত ভীতির একটি অন্যতম উৎস যা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান।

৪. অন্যান্য ধর্মীয় বিদ্যালয়

অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ও, তাদের ধর্মীয় বিদ্যালয় পরিচালনা করে, অনেক সময় সেগুলোর সঙ্গে ছাত্রাবাস ও এতিমখানাও যুক্ত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি একটি বিদ্যালয় দেখেছি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিচালিত যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা - বেশিরভাগ সাধারণত আদিবাসী পরিবার থেকে আসা - একসঙ্গে পাঠ নেয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালনা করে, সাধারণত যেগুলো 'মিশনারি স্কুল' হিসেবে পরিচিত, সবগুলোই জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। এসব খ্রিস্টান সম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই অ-খ্রিস্টান পরিবার থেকে আসা। আমি অভিযোগ শুনেছি যে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান চাপে আছে তাদের আভ্যন্তরীণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে, কারণ স্থানীয় প্রশাসন এসব বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য পদে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়ে।

৫. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগ চালু করা হয়। যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মমত, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ, প্রাসঙ্গিক পার্থক্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখার বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞান অর্জন করে। অধ্যাপক ও প্রভাষকগণ বিভিন্ন ধর্মমতে ঐতিহ্য এবং সেগুলোর উৎসের আধুনিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার বিষয়ে তাদের অঙ্গীকারের প্রকাশ ঘটান, এর মাধ্যমে সংস্কারের পথকে এগিয়ে নেন, যা শুধু লৈঙ্গিক সাম্য প্রতিষ্ঠার গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকজন অধ্যাপক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। কয়েক বছর আগে, এই বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার মাধ্যমে বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট আরো বাস্তবধর্মী প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

৬. কমিউনিটি-ভিত্তিক শিক্ষা

এটা উল্লেখ করা দরকার যে বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষা কর্মসূচি বিদ্যমান, যেমন, মন্দির বা গির্জায়। কয়েকটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এ বিষয়ে অনেক দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে ওইসব সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ক্ষেত্রে জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইত্যাদি পরিচয় সমপতিত হয়। এসব সম্প্রদায় গুরুত্ব দেয় তরুণ প্রজন্মের প্রতি, তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য, তাদের ভয় এমনটি না হলে দীর্ঘ মেয়াদে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে।

VI. ধর্ম সম্পর্কিত আইনি প্রশ্নসমূহ

১. ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনসমূহ

বাংলাদেশের আইনের বেশিরভাগ দিকই ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, ব্যক্তিগত মর্যাদার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো- যেমন বিয়ে, পারিবারিক জীবন, বিচ্ছেদ, শিশুদের দেখভালের দায়িত্ব, ভরনপোষণ, তদারকি, উত্তরাধিকার ইত্যাদি- এখনো ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ইসলামি আইন, হিন্দু আইন বা ক্যানন আইন ইত্যাদি প্রযোজ্য হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য নিজেদের কোনো ব্যক্তিগত মর্যাদা আইন নেই, কিন্তু তারা হিন্দু আইনের অধীনে থাকেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য নিজস্ব ব্যক্তিগত মর্যাদা আইন করার বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে প্রকল্প নেয়া হলেও সম্ভবত তা সাফল্যের মুখ দেখেনি। বাহাই সম্প্রদায় জানিয়েছে তারা নিজেদের পারিবারিক আইন অনুসরণ করে, যা সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনসমূহ সাধারণত বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগের জন্ম দেয়। যদিও বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মীয়-আদর্শ ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে কাঠামোটি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বহুত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়, তারপরও এই পদ্ধতি এত সহজ নয়, যদি আদৌ তা সম্ভব হয়, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীসমূহের জন্য আন্তঃধর্মীয় অংশিদারিত্বকে জায়গা দিতে পারে না। তাছাড়া, কিছু মানুষ - যেমন ধর্মান্তরী, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক ও অন্যান্যরা - ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনসমূহের সীমাবদ্ধ কাঠামোতে নিজেদের খাপখাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে হয়তো আরো বেশি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। এক্ষেত্রে আমি আলোকপাত করতে চাই যে ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা শুধু 'ধ্রুপদী' ধর্মের অনুসারীদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে নয়, বরং তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা অন্য ধর্মমতে বিশ্বাস করে, এক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকও অন্তর্ভুক্ত।

আন্তঃধর্মীয় বিয়ে শহরাঞ্চলে ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়ে উঠতে শুরু করলেও, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের এ ধরনের ঘটনা বিরল ঘটনা হিসেবেই পরিগনিত। একটি দেশে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে সেখানে আন্তঃধর্মীয় বিয়ের এমন অপ্রতুলতা খুবই বিস্ময়কর ঘটনা। আমার ধারণা হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনসমূহের জটিলতার প্রধান কারন বিদ্যমান কাঠামো থেকে যা এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় কিছু আন্তঃধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য, তাদের ধর্মীয় বিধানে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ব্যবস্থা করা গেলেও, অন্যদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। উদাহরণসরূপ, একজন মুসলিম নারী আইনসিদ্ধভাবে একজন অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন না। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে - ধর্মান্তরীকরণ বা অভিবাসন ছাড়া - ১৮৭২ সালের 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট' ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে বৈধ করার জন্য বর-কনে উভয়কেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে হয় যে তারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। এই চুক্তির শর্ত একটি অতি কঠোর সীমা টেনে দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে অনেকের জন্যই এটি একটি মোটামুটি অনতিক্রম্য বাধা। হয় তারা বাস্তবে নিজেদেরকে অবিশ্বাসী নয় বরং বিশ্বাসী হিসেবে মনে করে, অথবা তারা হয়তো যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে নিজেদের অবিশ্বাসী দাবি করে না, সমাজে একঘরে হওয়ার ভয়ে বা অন্যান্য ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এড়াতে। যত দিন পর্যন্ত অবিশ্বাসী ঘোষণা করার শর্ত বিশেষ বিবাহ আইনে যুক্ত থাকবে তত দিন পর্যন্ত এই আইন বাস্তবে সবার জন্য, যারা এর ব্যবহার করতে চায় তাদের কাছে, বিশেষ করে, আন্তঃধর্মীয় বিয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনসমূহের ব্যবস্থার বাধা ডিঙিয়ে উন্মুক্ত একটি নাগরিক বিয়ের উপায় হয়ে উঠতে পারবে না।

এই প্রেক্ষাপটে আমি জোর দিতে চাই যে ধর্মীয় পারিবারিক আইন ধারণাগতভাবে ধর্মীয় পারিবারিক মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা থেকে আলাদা। আইন (জীবনের যে পর্যায়ের জন্যই হোক না কেন) সবসময় নিজের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োগকারী অনুসঙ্গ বহন

করে। ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতার অধীনে ধর্মীয় আচার, প্রথা, অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধ বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের বিস্তৃত পরিসরে স্বাভাবিক সুরক্ষা অর্জন করলেও, রাষ্ট্রের বলবৎ করা ধর্ম নির্ভর আইন সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন একটি আন্তঃধর্মীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে না অথবা এ ধরনের বিয়ে ভেঙে যায় এবং স্ত্রী/স্বামী যিনি স্বামীর/স্ত্রীর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি পূর্বের ধর্মে ফিরতে চান। কিন্তু এ ধরনের ফিরে আসা বাস্তবে এমনিতেই অনেক কঠিন হয়ে যায়, এবং এটা আরো জটিল হয়ে পড়ে আইনি নিরাপত্তাহীনতার কারণে। ধর্ম পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট এই আইনি নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলোর মধ্যে আছে উত্তরাধিকার, শিশুর ভরণপোষণ ও দায়িত্ব নেয়ার মতো সংবেদনশীল বিষয়। ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার আওতায় থাকা ক্রমবর্ধমান সংকটগুলো বাদ দিলেও, প্রচলিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আইন সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের প্রতিফলন তুলে ধরে, এটা জানা থাকা সত্ত্বেও যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা আছে এবং সমান্তরালভাবে আলাদা অধিকারও আছে, বিয়ে, শিশু প্রতিপালন, দায়িত্বে রাখা, তদারকি, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিম-লে বর্তমানের ধর্মীয় আইনের ব্যবস্থা একটি সমন্বিত পারিবারিক আইনের মধ্যমে প্রতিস্থাপনের দাবি থাকলেও এখন পযন্ত সেটা সাফল্যের মুখ দেখেনি। ১৯৮০ ও ৯০এর দশকে এ ধরনের দাবির বিষয়টি অনেক বেশি উচ্চারিত হলেও, দেখা যাচ্ছে সেটা অনেকখানি গতি হারিয়েছে বর্তমান সামাজিক আবহে, যেখানে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে দেখা হচ্ছে খুব স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে। তারপরও, আমি হিন্দু নারীদের কাছ থেকে আবেগপূর্ণ বর্ণনা শুনেছি যারা নিজেদের খুবই বৈষম্যের শিকার মনে করেন বর্তমান হিন্দু ব্যক্তি মর্যাদা আইনের শাসনের অধীনে। তারা চান ধর্ম নিরপেক্ষ পারিবারিক আইনের মাধ্যমে এটা প্রতিস্থাপন করা হোক যে আইন সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং সেখানে কোনো জেন্ডার বা ধর্ম বা পার্থক্যনির্ণায়ক আর কোনো শর্ত আরোপ করা থাকবে না। এই বিষয়টি সম্ভবত আভ্যন্তরীণভাবে আরো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান।

সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপের সময়, ধর্ম-ভিত্তিক ব্যক্তি মর্যাদার আইনের জটিলতা মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমি একটি অনিচ্ছার মনোভাব টের পেয়েছি, একটি মেরুকরণশীল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে কেউ প্রস্তুত না। বরং সরকার বিদ্যমান কাঠামোতে ধারাবাহিক সংস্কার করার বিষয়টিকে উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং আইনের শিথিল প্রয়োগ ঘটাচ্ছে যা নারীর অবস্থার হয়তো কিছুটা উন্নতি বয়ে আনবে, এসব আইনের ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ না করেই। এ ধরনের সতর্ক, বাস্তবধর্মী ধারা গ্রহণ করায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। ২০১১ সালে একটি সংস্কার আনা হয় হিন্দু বিয়ে নিবন্ধন করানোর বিষয়ে। হিন্দু নারীদের জন্য আরেকটু বেশি আইনি সুরক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্কার আনা হয়। যদিও, হিন্দু বিয়ে নিবন্ধন এখনো ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে, যার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অমীমাংসিতই থেকে গেছে।

২. ধর্ম-সম্পর্কিত অপরাধ

বাংলাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধিতে ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননার আইন আছে যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের সময়ে প্রথম প্রণয়ন করা হয়, এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আছে "ধর্মানুভূতিতে আঘাত" প্রতিরোধ সংক্রান্ত ধারা, যার উল্লেখ আছে ফৌজদারি আইনের ২৯৫এ ধারায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের (আইসিটি অ্যাক্ট) ৫৭ নম্বর ধারাকে অনেকে ফৌজদারি আইনের ২৯৫এ ধারার 'অনলাইন সংস্করণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। পাশাপাশি আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার প্রয়োগের পরিধিও আরও বিস্তৃত এবং শাস্তির বিধানও অনেক বেশি কঠোর। এর চেয়েও বড় কথা হলো, ফৌজদারি আইনের যেসব প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা রয়েছে সেগুলো ৫৭ ক) ধারার ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয় এবং যার কারণে এর পরিধি ও প্রয়োগের এখতিয়ার মূলত সরকারের হাতেই ন্যস্ত। যদিও আমি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বের করতে পারিনি ঠিক কতোটা নিয়মিতভাবে ৫৭ ধারা ব্যবহার করা হয়েছে ধর্মানুভূতিতে আঘাত বা এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে, তারপরও বলা যায় এই আইন নিঃসন্দেহে সুশীল সমাজের সংস্থাগুলো, মানবাধিকার কর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর এক ধরনের শিহরণ জাগানো প্রভাব ফেলেছে। এটা সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের পরিসরকে সংকুচিত করার ক্ষেত্রে।

সরকারের বক্তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, আমার কাছে প্রকাশ করেছেন তা আমি তুলে ধরতে চাই, সাধারণ পরামর্শ হলো অহেতুক উষ্কানি এড়িয়ে যাওয়া, বিশেষ করে ধর্মের বিষয়ে। একটি বহু ধর্মের সমাজে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুভূতি এবং 'ট্যাবু' কাজ করে সেখানে সংবেদনশীলতা গড়ে তোলা এবং সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি সভ্যতা শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হওয়া উচিত।

এছাড়াও, গণমাধ্যম তাদের নিজস্ব সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, এবং আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ এ ধরনের যেকোনো কার্যক্রমে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আরো অনেক কিছু করার আছে এবং করা উচিত।

তাছাড়া, এটাও একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয় এবং মাঝেমাঝে অবশ্যই সীমিত করা উচিত। যাইহোক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ জরুরি হয়ে উঠলে অবশ্যই তা পরিস্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং সাংবিধানিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সব শর্ত মেনেই তা করতে হবে। এরইমধ্যে পুরান ফৌজদারি আইনের ২৯৫এ ধারা এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, এর অস্পষ্ট ব্যাখ্যার কারণে, এবং একই ধরনের সবকিছুই আরো বেশি সত্য আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার সম্পর্কে। এই দুটি ধারার অধীনে অপরাধের বিষয়গুলো অস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে- পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত না করে- এবং এ কারণে খুবই ব্যক্তি বিবেচনা ও স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগের ঝুঁকিতে আছে। কিছু কট্টরপন্থি মুসলিম ধর্মগুরুর জন্য আহমাদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই এক ধরনের উষ্কানি হিসেবে কাজ করে যা তাদের অনুভূতিকে 'আঘাত' করে। কোনো আইনের শাসনই এ ধরনের ব্যক্তি অনুভূতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে না। আমি জানতে পেরেছি আইসিটি আইনের ৫৭ ধারাও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে বিতর্কিত হিসেবে সমিচীন হয়েছে।

VII. আরও জানার জন্য নতুন বিষয়

১. ধর্মমত বা বিশ্বাসের চর্চার স্বাধীনতার মধ্যে আদিবাসীদের 'আধ্যাত্মবাদ'কেও অন্তর্ভুক্তকরণ

আগে উল্লেখ করা সমস্যা (ধর্মীয় ভূমি সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা, যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষকের অভাব, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ইত্যাদি) ব্যাতিরেকেও আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের বঞ্চিত ভাবতে পারে আধ্যাত্মবাদের বিষয়ে তাদের বিস্তৃত ধারণার কারণে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা চর্চার স্বাভাবিক অনুশীলণের মধ্যে সহজে খাপ খায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আলাদাভাবে নির্দিষ্ট প্রার্থনার ঘরে বসে প্রার্থনা করার পরিবর্তে, আদিবাসীরা প্রায়ই প্রাকৃতিক স্থানগুলোতে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যায়, যেগুলোর স্থানিক সীমানা খুব সহজেই, আদৌ যদি সম্ভব হয়, সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে এতোটাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যে আচরণ বা অনুশীলন থেকে ধর্মীয় এবং ধর্মবিহীন অংশকে আলাদা করা যায় না। ধর্মীয় আনুগত্যও, প্রচলিত মূলধারার ধর্মগুলোর তুলনায় কম স্পষ্ট এবং হয়তো বিভিন্ন ধর্মের উপকরণও অনেক ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে যায়। 'সিনক্রিটিসিজম' শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়, যা একটি মর্যাদাহানীকর অর্থ বহন করে বলে সাধারণত ধারণা করা হয়।

ধর্ম বা বিশ্বাসের চর্চার স্বাধীনতার জন্য একটি সমন্বিত আবেদন গড়ে তোলা দরকার, যেমন মানুষের মধ্যে খোলা মনের চর্চা থাকতে পারে যেখানে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে ধর্ম বিশ্বাস, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যে তাদের কাছে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসীর আধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং, কারণ এসব ব্যক্তিরা তাদের নির্দিষ্ট দাবির বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, কারণ বিষয়গুলো তারা ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিদিনের জীবন-জগতের অংশ হিসেবে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করে আসছে। এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে খোলাখুলি যোগাযোগ, যা থেকে ধরে নেয়া যায় মানবাধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আদিবাসীর অধিকারকেও সম্মান জানানোর আগ্রহ রয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও এ বিষয়ে মত দিয়েছে।

২. হিজরা বা অন্যান্য লিঙ্গ-সংখ্যালঘুদের জন্য ধর্মমত বা বিশ্বাস অনুশীলনের স্বাধীনতা

দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে, সাধারণত 'হিজরা' নামে ডাকা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাদের অবস্থান কমবেশি মেনে নেয়া হয়েছে, সাধারণভাবে মানব জীবনের বৈচিত্র্য হিসেবে ধরে নিয়ে। আমি জেনেছি কিছু হিজরা তাদের নিজস্ব ধর্ম চর্চা গড়ে তুলেছে যার একটি বড় অংশ হিন্দুদের ধর্মাচার থেকে ধার করা। অন্য হিজরারা প্রচলিত ধারার ধর্মীয় জীবনযাপন অনুসরণ করে, যেমন শুক্রবারের প্রার্থনায় বা গির্জার প্রার্থনায় অংশ নেয় অনেকটা নিভৃতচারী হিসেবে।

তবে অন্য লিঙ্গ-সংখ্যালঘুরা সমাজে হিজরাদের মতো গ্রহণযোগ্যতা পায় না এবং প্রায়ই মৌখিক বা আরও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়। লিঙ্গ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা, অন্যদের মতো, তাদের ধর্মীমত বা বিশ্বাস স্বাধীনভাবে চর্চা করবে-- এমন ধারণা অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক বা অনেকক্ষেত্রে অচিন্তনীয়। দেখা যায় এটি একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী যে লিঙ্গ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অবশ্যই 'অবিশ্বাসী', যেহেতু তাদের আচরণ ধর্মীয় নৈতিকতার প্রথাগত ব্যাখ্যার লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে, যদিও, লিঙ্গ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি নিজেদেরকে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বসের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করে। এসব মানুষের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই বিষয়টি অনেক বেশি সত্য।

লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ধর্ম চর্চার বা বিশ্বাসের চর্চার স্বাধীনতার বিষয়টি খুবই কম আলোচিত হয়, যা আরও বেশি মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে। বৈচিত্র্যপূর্ণ বা ভিন্নতর সেক্সচুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং লিঙ্গ পরিচয় প্রত্যেক সমাজের জন্যই একটি বাস্তবতা এবং এটি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কোনো উদ্ভাবন নয় যা অনেকেই ধারণা করে থাকতে পারে। এখানে একমাত্র প্রশ্নটি হচ্ছে এই বাস্তবতাকে কীভাবে স্বীকৃতি দেয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি পথ খোলা গেলে সংস্কার এবং ভিত্তিহীন উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে, যা ওইসব মানব সন্তানকে আরেকটু শ্বাস নেয়ার জায়গা করে দেবে যারা অন্যথায় তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আড়াল করতে বাধ্য হবে। আমি জানতে পেরেছি সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ায় এই বিষয়গুলোর ওপর একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে লিঙ্গ-পরিচয়ের নিরিখে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা। একটি আশাব্যাঞ্জক প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি ওই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই। ওই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকেও কয়েকজন ছিলেন।

৩. ধর্মীয় বিদ্বেষ উৎসাহিতকরণের বিরুদ্ধে যোগাযোগীয় পদক্ষেপ

বর্তমান সময়ে ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়ানো সব সমাজের জন্যই একটি হুমকি সৃষ্টি করে। বাংলাদেশেও এটা ঐতিহ্যগতভাবে আবহমানকাল ধরে চলে আসা মানুষের জীবনযাত্রায় আন্তঃধর্মীয় সুসম্পর্কের ওপর কালো ছায়া ফেলেছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ মানুষকে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে, সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত করে স্বাধীনভাবে বা নির্ভয়ে তার ধর্মবিশ্বাসের চর্চায়।

ধর্মীয় বিদ্বেষ ও প্ররোচনার অভিশাপের প্রতি, সম্প্রতি জাতিসংঘের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত পরিসরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে, এর মধ্যে এশিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচনায় ২০১২ সালের রাবাত প্ল্যান অব অ্যাকশন বর্ণনা করা হয়, যেখানে বলা হয়, কীভাবে প্ররোচনা-রোধ বিষয়ক নীতিমালার ভিত্তি কি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে, রাবাত প্ল্যান অব অ্যাকশন-এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়; আলোচিত হয় কীভাবে যোগাযোগের প্রসার ধর্মের নামে ঘৃণ্য কর্মকা- বন্ধে ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তঃধর্মীয় আলোচনা, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যথাযথ উপস্থাপন ও অন্যান্য যোগাযোগীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে রাবাত প্ল্যান গুরুত্ব আরোপ করে। মোটের ওপর, হেট স্পিচ বা ঘৃণা-ছড়ানো বক্তব্যের জবাব দিতে হবে 'পজেটিভ স্পিচ' বা 'ইতিবাচক বক্তব্য' তুলে ধরার মাধ্যমে। এর জন্য বিস্তৃত পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গনের স্টেকহোল্ডারদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করা জরুরি। এটা সম্ভব করতে, অবশ্য, যোগাযোগের স্বাধীনতাও দরকার, দরকার বাক স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং ধর্ম পালন বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা খর্ব করা নয় - এগুলোর সবই একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এসব অধিকারের সীমাবদ্ধতা, ধরা যাক, যদি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জরুরি বলে পরিগণিতও হয়, সবসময়ই একটি বৃহত্তর প্রবেশস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত এবং অবশ্যই পরিস্কারভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে পাবলিক ডিসকোর্সের স্থান সংরক্ষিত থাকে, যা একটি রাজনৈতিক ও আইনি নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে দ্রুত সংকুচিত হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ আশির্বাদপুষ্ট একটি সক্রিয় নাগরিক সমাজ এবং বিস্তৃত বৈচিত্র্যমি-ত গণমাধ্যম দ্বারা, যার মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ্য আলোচনায় অংশ নিতে পারে। ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার ধারণার প্রেক্ষাপটে, এগুলো মূল্যবান সম্পদ, যা সাধুবাদ পাওয়ার, সুযোগ পাওয়ার এবং আরও উন্নতির আশা করে। একটি ক্রমবর্ধমান মেরুকরণীয় পরিবেশে অবশ্যই এটা কোনো সহজ কাজ নয়। জনগণের অংশগ্রহণের পরিসর কমে যাওয়া নিয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলো যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তা যেকোনো মূল্যে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নেয়া উচিৎ, যেহেতু তারা জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করছে। নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের জন্য আরও আইনি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি না করে বরং সেটি করাই শ্রেয়। ফ্র্যাংক পাবলিক ডিসকোর্স-এর সংস্কৃতি সবার ক্ষেত্রেই ধর্মের বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার স্বার্থে কাজ করে, কারণ ধর্ম নিয়ে মুক্তমনের চর্চার জন্য দরকার উন্মুক্ত পরিসর যা সমন্বিত ধর্মনিরপেক্ষতার সহায়তায় অর্জিত হয়, যা বাংলাদেশের সংবিধানে খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত।

VIII. সমাপনী মন্তব্য

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিকভাবে উন্মুক্ত মননের চর্চার একটি আশাব্যাঞ্জক ধারাবাহিকতা রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি, যা ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো, বৈষম্যহীনভাবে সবার জন্য ধর্ম চর্চা ও বিশ্বাস-

সম্পর্কিত বহুত্ববাদকে ধারণ করার একটি উপযুক্ত কাঠামো সরবরাহ করে। এ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি আরো দৃঢ় হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোকে অনুসমর্থন জানানোর মধ্যদিয়ে, যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ।

আমি জানতে পেরেছি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রধানত একটি সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়ে থাকে। ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রকাশের বিষয়টি ব্যক্তি জগতে, ঠেলে দেয়ার পরিবর্তে (যা বিশ্বের অন্য অনেক প্রান্তেই যা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ছায়ায় ঘটে থাকে), ধর্মনিরপেক্ষতা এখানে কাজ করে অনেকটাই জায়গা করে দেয়ার নীতি নিয়ে, প্রকাশ্য পরিম-লেও। এই ধারণার আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, কারণ গণতন্ত্রও, উন্মুক্ত তর্ক তুলে ধরার জন্য একটি প্রকাশ্য পরিম-ল তৈরির ধারণায় আস্থাশীল ও সহায়ক ভূমিকা রাখে। নিবর্তনমূলক আইন-কানুন ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ, যা বর্তমানে সম্ভবত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও জনগণের মুক্ত আলোচনার পরিসরকে সংকুচিত করছে, যা কী-না ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছিলো, ওই উদ্যোগগুলো হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাদের সেই অভিষ্ট নীতি থেকে দূরে সরে যায়।

সরকারের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের কর্মী, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং অন্য আলোচকদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যদিয়ে আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান, খোলামন নিয়ে এগিয়ে চলা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে আমি অনেক ইতিবাচক প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত পেয়েছি - ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় মেরুকরণের মুখেও। যে দশটি দিন আমি বাংলাদেশে কাটিয়েছি, তা ছিলো আমার জন্যে সবচেয়ে দারুন শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। এই সফরের পরও, তথ্য, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের আদান-প্রদান অবশ্যই অব্যাহত থাকবে, এবং সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আগামীতে আরও সহযোগিতামূলক কর্মকা-ের বিষয়ে আমি আশাবাদী। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

***